এ.কে. খন্দকার

(জন্ম: জানুয়ারি ১, ১৯৩০) বাংলাদেশের একজন সেনাকর্মকর্তা যিনি সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণের পর রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। তাঁর পুরো নাম আব্দুল করিম খন্দকার। তিনি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রধান ছিলেন। অবসরগ্রহণকালে তাঁর পদবী ছিল এয়ার ভাইস মার্শাল। ২০০৯-এ বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনে অংশ নিয়ে তিনি বাংলাদেশ সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁকে মন্ত্রী নিয়োগ করেন। রাষ্ট্রপতি জিয়া ও এরশাদের শাসনামলে তিনি অস্ট্রেলিয়া ও ভারতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। উপরন্তু রাষ্ট্রপতি এরশাদের আমলেও তিনি বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁকে সচরাচর এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ.কে. খন্দকার হিসাবে উল্লেখ করা হয়। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন ও উপ-প্রধান সেনাপতি হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রী হিসেবে কাজ করছেন।

জন্ম ও শিক্ষাজীবন

এ.কে. খন্দকারের জন্ম ১৯৩০ সালের ১ জানুয়ারি। পিতার তৎকালীন কর্মস্থল রংপুর শহরে। তাঁর বাড়ি পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার ভারেঙ্গা গ্রামে। তাঁর পিতা খন্দকার আব্দুল লতিফ ব্রিটিশ আমলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং মাতা আরেফা খাতুন ছিলেন একজন আদর্শ গৃহিনী। চার ভাই ও এক বোনের মধ্যে এ কে খন্দকার ছিলেন তৃতীয়। পিতার চাকুরির সুবাদে তাঁর শিক্ষা জীবনের শুরু হয় বগুড়া শহরে। তিনি সেখানে বগুড়া করোনেশন স্কুলে কিছুদিন পড়াশোনা করেন। তারপর পিতার বদলির কারণে তাঁদেরকে নওগাঁ চলে যেতে হয়। সেখানে নওগাঁ করোনেশন স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল এবং মালদা জেলা স্কুলে। ভারত বিভাগের সময় এ.কে. খন্দকার ১৯৪৭ সালে মালদা জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন।

কর্মজীবন

১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বরে পিএএফ থেকে তিনি তার কমিশন লাভ করেন। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তিনি ফাইটার স্কোয়াড্রন হিসেবে কাজ করেন ও পরে ফ্লাইং ইন্সট্রাক্টর হয়ে ওঠেন। তিনি পাকিস্তান এয়ার ফোর্স একাডেমীতে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ছিলেন। ফ্লাইং ইন্সট্রাক্টর স্কুলে তিনি ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ফ্লাইট কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে জেট ফাইটার কনভারশন স্কোয়াড্রনে তিনি ফ্লাইট কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ১৯৬০ সাল পর্যন্ত। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত তিনি স্কোয়াড্রন কমান্ডার হিসেবে কাজ করেন পিএএফ একাডেমীতে। পরে জেট ফাইটার কনভারশন স্কোয়াড্রনে তিনি স্কোয়াড্রন কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত। ট্রেনিং উইং-এর অফিসার কমান্ডিং হিসেবে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত তিনি পিএএফ একাডেমীতে দায়িত্ব পালন করেন। পিএএফ প্ল্যানিং বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি ১৯৬৯ সালের আগ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। পরে তিনি সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসেবে পিএএফ বেইসের দায়িত্ব পান ঢাকায় ১৯৬৯ সালে।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ

এ.কে. খন্দকার উইং কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। ২১শে নভেম্বর ১৯৭১ সালে তিনি পদোন্নতি পান গ্রুপ ক্যাপ্টেন হিসেবে বাংলাদেশের তৎকালীন অন্তর্বর্তী সরকার থেকে এবং জেনারেল এম. এ.

জি. ওসমানী'র ব্যক্তিগত ডেপুটি ইন চার্জ বা উপ-প্রধান সেনাপতি হিসেবেও নিয়োগ পান। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ভারতীয় সরকার বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রায় সব উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে, যেমন -প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ, ১১ জন সেক্টর কমান্ডার, লেফট্যানেন্ট কর্নেল কে. এম. সফিউল্ল্যাহ-সহ এ.কে. খন্দকারকেও ঢাকায় নিয়ে আসেন পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠান দেখতে। স্বাধীনতার পর তিনি এয়ার কমোডর হিসেবে দায়িত্ব পান ও আওয়ামী লীগের তত্বাবধানে স্বাধীনতায় বীরত্বের পুরস্কার কমিটিতে জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানী'র প্রধান সহকারী হিসেবে কাজ করেন। এই কমিটির কাজের ফলাফল ছিল ছিদ্রযুক্ত ও ব্যাথাহীন। যিনি কলকাতায় স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় একটা দালানে সময় কাটিয়েছেন তিনি রহস্যজনকভাবে বীরউত্তম খেতাব পান। তার সহকারী স্কোয়াড্রন লিডার বদরুল আলমও বীরউত্তম খেতাব পান। ১৯৭৩ সালে তিনি এয়ার ভাইস মার্শাল হিসেবে পদন্নোতি পান ও সিওএএস হিসেবে ১৯৭৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ বিমান-এর চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি অবসরে যান মুশতাকের সরকারের সময়।

রাজনৈতিক জীবন

১৯৭৭ সালে জিয়াউর রহমানের সরকারের সময় ভারতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ পান। ১৯৮৬ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৯০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তিনি এরশাদের সরকারের সাথে কাজ করেন পরিকল্পনা মন্ত্রী হিসেবে। এর আগে তিনি অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ পান। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে জনসচেতনতা ছড়ানো উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের চেয়ারম্যান হিসেবে ২ বছর তিনি দায়িত্ব পালন করেন। ৬ই জানুয়ারী ২০০৯ সালে তিনি বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পান ও তিনি একজন সংসদ সদস্য। নিজ এলাকার জনগণের কাছে অঙ্গীকার করেছেন যে, নদী ভাঙ্গনের কবল থেকে তাদের রক্ষা করতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

ড. এ. বি. মীর্জা আজিজুল ইসলাম

কামাল লোহানী (আবু নাইম মোহা. মোস্তফা কামাল খান লোহানী)

বাবা: সুজা লোহানী (প্রয়াত)

মা: রোকেয়া লোহানী (প্রয়াত)

স্ত্রী: দীপ্তি লোহানী (প্রয়াত)
জন্ম তারিখ: ২৬ জুন, ১৯৩৪
জন্মস্থান: খান মনতলা, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

১৯৫৩ সালে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে পড়ার সময় গ্রেপ্তার হন।
১৯৫৪ সালে আবার গ্রেপ্তার, রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে, ৫৫ সালে মুক্ত।
মুক্তির পর পাবনা থেকে ঢাকা।
সাংবাদিকতায় প্রবেশ।
সংস্কৃতিক্ষেত্রে অবদান: ছায়ানট সম্পাদক পাঁচ বছর, বর্তমানে গণশিল্পী সংস্থার সভাপতি।

জন্ম ও পারিবারিক জীবন

কামাল লোহানীর জন্ম সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া থানার সনতলা গ্রামে। বাবা আবু ইউসুফ মোহাম্মদ মুসা খান লোহানী। মা রোকেয়া খান লোহানী।

শিক্ষাজীবন

কামাল লোহানী প্রথমে কলকাতার শিশু বিদ্যাপীঠে পড়াশুনা শুরু করেন। দেশভাগের পর ১৯৪৮ সালে পাবনা চলে যান। ভর্তি হলেন পাবনা জিলা স্কুলে। ১৯৫২ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। এরপর ভর্তি হন পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে। এই কলেজ থেকেই উচ্চমাধ্যমিক পাস করেন। আর উচ্চমাধ্যমিক পাস করার পরই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ইতি টানেন তিনি।

কর্মজীবন

কামাল লোহানী 'দৈনিক আজাদ', 'দৈনিক সংবাদ', 'দৈনিক পূর্বদেশ', 'দৈনিক বার্তা'সহ বিভিন্ন পত্রিকার কর্মরত ছিলেন। তিনি সাংবাদিক ইউনিয়নে দুদফায় যুগ্ম-সম্পাদক এবং ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি হন। তিনি গণশিল্পী সংস্থার সভাপতি ছিলেন। ১৯৬২ সালে স্বল্পকাল কারাবাসের পর কামাল লোহানী 'ছায়ানট' সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সাড়ে চার বছর এই দায়িত্ব পালন করেন। এরপর মার্কসবাদী আদর্শে ১৯৬৭ সালে গড়ে তোলেন 'ক্রান্তি'।

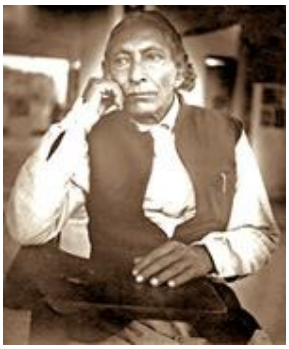

বন্দে আলী মিয়া

(জন্ম: ১৭ জানুয়ারি, ১৯০৬ - মৃত্যু: ২৭ জুন, ১৯৭৯) একজন বাংলাদেশী কবি, ঔপন্যাসিক, শিশু-সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও চিত্রকর। তিনি পাবনা জেলার রাধানগর গ্রামে এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা ও কর্মজীবন

তিনি পাবনার মজুমদার একাডেমী থেকে ১৯২৩ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে কলকাতা আর্ট একাডেমীতে ভর্তি হন এবং ১ম বিভাগে উত্তীর্ন হন। ১৯২৫-এ ইসলাম দর্শন পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত কলকাতা কর্পোরেশন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। দেশ বিভাগের পর তিনি কলকাতা জীবনে রবীন্দ্র-

নজরুলের সান্নিধ্য লাভ করেন। তখন তাঁর প্রায় ২০০ খানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সে সময় বিভিন্ন গ্রামোফোন কোম্পানীতে তাঁর রচিত পালাগান ও নাটিকা রের্কড আকারে কলকাতার বাজারে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১৯৬৪-র পর প্রথমে ঢাকা বেতারে ও পরে রাজশাহী বেতারে চাকরি করেন। তিনি তাঁর কবিতায় পল্লী প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনায় নৈপুন্যের পরিচয় প্রদান করেছেন। প্রকৃতির রূপ বর্ণনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর রচিত শিশুতোষ গ্রন্থ আজও অমর হয়ে আছে।

গ্রন্থসমূহ

ময়নামতির চর
অরণ্য
গোধূলী
ঝড়ের সংকেত
নীড়ভ্রষ্ট
জীবনের দিনগুলো
অনুরাগ

কাব্যগ্রন্থ

ময়নামতির চর (১৯৩২)
অনুরাগ (১৯৩২)।

শিশুতোষ গ্রন্থ

চোর জামাই (১৯২৭)
মেঘকুমারী (১৯৩২)
মৃগপরী (১৯৩৭)
বোকা জামাই (১৯৩৭)
কামাল আতার্তুক (১৯৪০)
ডাইনী বউ (১৯৫৯)
রূপকথা (১৯৬০)
কুঁচবরণ কন্যা (১৯৬০)
ছোটদের নজরুল (১৯৬০)
শিয়াল পন্ডিতের পাঠশালা (১৯৬৩)
বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

সম্মাননা

শিশু সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য তিনি ১৯৬২ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার এবং ১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট পুরস্কার লাভ করেন। তিনি মরণোত্তর একুশে পদক এ ভূষিত হন।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল

(জন্ম: ৩ ডিসেম্বর, ১৯৩৬ - মৃত্যু: ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯) বাংলাদেশের একজন বরেন্য শিক্ষাবিদ, কবি এবং লেখক।

জন্ম

তিনি পাবনার গোবিন্দা গ্রামে ১৯৩৬ সালের ৩রা ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা

তিনি ১৯৫২-তে পাবনা জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক ও ১৯৫৪-তে ঢাকা কলেজ থেকে আইএ পাস করেন। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ত্রয়োদশ স্থান এবং আইএ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে সপ্তম স্থান অধিকার করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৮-তে বাংলায় বিএ অনার্স এবং একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৯-এ বাংলায় এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেঙলি প্রেস অ্যান্ড লিটারারি রাইটিং-১৮১৮-১৮৩১ শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে পিএইচ ডি ডিগ্রি অর্জণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্য

আপন যৌবন বৈরী (১৯৭৪)
যেহেতু জন্মান্ধ (১৯৮৪)
আক্রান্ত গজল (১৯৮৮)
প্রবন্ধ-গবেষণা
শিল্পীর রূপান্তর (১৯৭৫)
The Bengali Press and Literary Writing (১৯৭৭)
কথা ও কবিতা (১৯৮১)

পুরস্কার

আলাওল পুরস্কার (১৯৭৫)
সুহৃদ সাহিত্য স্বর্ণপদক (১৯৮৬)
একুশে পদক (১৯৮৭)
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ স্বর্ণপদক (১৯৮৯)
সাদত আলী আকন্দ স্মৃতি পুরস্কার (১৯৯১)

মৃত্যু

তিনি ১৯৮৯ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

সুচিত্রা সেন

(এপ্রিল ৬ ১৯২৯) অথবা এপ্রিল ৬, ১৯৩১ ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বিখ্যাত অভিনেত্রী । বিশেষ করে উত্তম

কুমারের সাথে অভিনয়ের কারনে তিনি সারা বাংলায় প্রচন্ড জনপ্রিয় হন। উত্তম-সুচিত্রা জুটি আজও বাংলা চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ জুটি হিসেবে পরিগনিত। বর্তমানে তিনি নিভৃত জীবনযাপন করেন। যখন তিনি অভিনয় ছেড়ে দিয়েছিলেন সে পর্যায়ে তিনি ধীরে ধীরে সেরা নায়িকার অবস্থান হারাচ্ছিলেন বলে কথিত আছে।
তিনিই প্রথম ভারতীয় অভিনেত্রী যিনি কোন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার পান (শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী পুরস্কার - *সাত পাকে বাঁধা* ১৯৬৩ ছবির জন্য, মস্কো চলচ্চিত্র উৎসব)।

<u>প্রারম্ভিক জীবন</u>

১৯৩১ সালের ৬ এপ্রিল এখনকার সিরাজগঞ্জ জেলারবেলকুচি উপজেলার সেনভাঙার জমিদার বাড়িতে রমা দাশগুপ্ত (পরবর্তীতে সুচিত্রা সেন নামে পরিচিত হন) জন্ম নেন।পরে পাবনা শহরের দিলালপুরের বাড়িতে কেটেছে তার শৈশব ও কৈশোর। সুচিত্রা সেন পাবনা সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। ১৯৬০এর দশকে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সময় পশ্চিমবঙ্গে চলে যান তারা।দেশ ত্যাগের সময় পাবনা শহরের দিলালপুরে প্রায় দুই বিঘা জমির উপর একতলা ভবন, পাশের প্রায় তিন বিঘা জমি, সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলার সেনভাঙায় জমিদার বাড়িসহ প্রায় দুশ' বিঘা জমি রেখে যায় সুচিত্রা সেনের পরিবার। ভারতের একজন প্রখ্যাত শিল্পপতির সন্তান দিবানাথ সেনকে তিনি বিয়ে করেন। ১৯৪৭ সালে তার একটি মেয়ে হয় যার নাম মুনমুন সেন। সুচিত্রা সেনের বাবা করুণাময় দাশগুপ্ত ছিলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও মা ইন্দিরা দাশগুপ্ত একজন গৃহবধু। তিনি বাবা-মায়ের পঞ্চম সন্তান এবং তৃতীয় কন্যা ছিলেন। পাবনাতেই তাঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষাদীক্ষা শুরু হয়।

চলচ্চিত্র জীবন

১৯৫২ সালে *শেষ কোথায়* ছবির মাধ্যমে তার চলচ্চিত্রে যাত্রা শুরু হয় কিন্তু ছবিটি মুক্তি পায়নি।
পরবর্তী বছরে উত্তম কুমারের বিপরীতে *সাড়ে চুয়াত্তর* ছবিতে তিনি অভিনয় করেন। ছবিটি বক্স-অফিসে সাফল্য লাভ করে এবং উত্তম-সুচিত্রা জুটি উপহারের কারনে আজও স্মরনীয় হয়ে আছে। বাংলা ছবির এই অবিসংবাদিত জুটি পরবর্তী ২০ বছরে ছিলেন আইকন স্বরূপ।
১৯৫৫ সালের দেবদাস ছবির জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার জিতেন, যা ছিল তার প্রথম হিন্দি ছবি। উত্তম কুমারের সাথে বাংলা ছবিতে রোমান্টিকতা সৃষ্টি করার জন্য তিনি বাংলা চলচ্চিত্রের সবচেয়ে বিখ্যাত অভিনেত্রী। ১৯৬০ ও ১৯৭০ দশকে তার অভিনীত ছবি মুক্তি পেয়েছে। স্বামী মারা যাওয়ার পরও তিনি অভিনয় চালিয়ে গেছেন, যেমন হিন্দি ছবি আন্ধি। এই চলচ্চিত্রে তিনি একজন নেত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। বলা হয় যে চরিত্রটির প্রেরণা এসেছে ইন্দিরা গান্ধী থেকে। এই ছবির জন্য তিনি *ফিল্মফেয়ার* শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছিলেন এবং তার স্বামী চরিত্রে অভিনয় করা সঞ্জীব কুমার শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার জিতেছিলেন।
১৯৭৮ সালে সুদীর্ঘ ২৫ বছর অভিনয়ের পর তিনি চলচ্চিত্র থেকে অবসরগ্রহণ করেন। এর পর তিনি লোকচক্ষু থেকে আত্মগোপন করেন এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সেবায় ব্রতী হন। ২০০৫ সালে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারের জন্য সুচিত্রা সেন মনোনীত হন, কিন্তু ভারতের প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে সশরীরে পুরস্কার নিতে দিল্লী যাওয়ায় আপত্তি জানানোর কারনে তাকে পুরস্কার দেয়া হয় নি।
তার মেয়ে মুনমুন সেন এবং নাতনী রিয়া সেন ও রাইমা সেন ও চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন।

<u>উত্তম কুমারের সাথে অভিনয়</u>
<u>চলচ্চিত্রের তালিকা</u>

সাড়ে চুয়াত্তর (১৯৫৩)
ওরা থাকে ওধারে (১৯৫৪)
অগ্নিপরীক্ষা (১৯৫৪)
শাপমোচন (১৯৫৫)
সবার উপরে (১৯৫৫)

সাগরিকা (১৯৫৬)
পথে হল দেরি (১৯৫৭)
হারানো সুর (১৯৫৭)
দীপ জ্বেলে যাই (১৯৫৯)
সপ্তপদী (১৯৬১)
বিপাশা (১৯৬২)
চাওয়া-পাওয়া
সাত-পাকে বাঁধা (১৯৬৩), এজন্য মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে তিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন
হসপিটাল
শিল্পী (১৯৬৫)
ইন্দ্রাণী (১৯৫৮)
রাজলক্ষী ও শ্রীকান্ত (১৯৫৮)
সূর্য তোরণ (১৯৫৮)
উত্তর ফাল্গুনি (১৯৬৩) (হিন্দিতে পুনঃনির্মিত হয়েছে মমতা নামে)
গৃহদাহ (১৯৬৭)
ফরিয়াদ
দেবী চৌধুরানী (১৯৭৪)
দত্তা (১৯৭৬)
প্রণয় পাশা
প্রিয় বান্ধবী

<u>স্যামসন এইচ চৌধুরী</u>

(জন্ম:২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯২৫ - মৃত্যু: ৫ জানুয়ারি, ২০১২) বাংলাদেশের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি ছিলেন। শীর্ষস্থানীয় এ শিল্পোদ্যোক্তা স্কয়ার গ্রুপের চেয়ারম্যান ছিলেন।

<u>জন্ম ও পারিবারিক জীবন</u>

স্যামসন এইচ চৌধুরীর জন্ম ১৯২৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ফরিদপুর জেলায়। তাঁর বাবা ই এইচ চৌধুরী ও মা লতিকা চৌধুরী। তাঁর স্ত্রীর নাম অনিতা চৌধুরী। তাঁর তিন ছেলে - অঞ্জন চৌধুরী, তপন চৌধুরী ও স্যামুয়েল চৌধুরী ।

<u>শিক্ষাজীবন</u>

১৯৩০-৪০ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতার বিষ্ণুপুর উচ্চবিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। এখান থেকেই তিনি সিনিয়র কেমব্রিজ ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি স্কুল থেকে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্মজীবন

স্যামসন এইচ চৌধুরীর বাবা ছিলেন আউটডোর ডিসপেনসারির মেডিক্যাল অফিসার। বাবার পেশার সুবাদে ছোটবেলা থেকেই ঔষুধ নিয়ে তিনি নাড়াচাড়া করেছেন। ভারত থেকে শিক্ষাজীবন শেষ করে ফিরে আসেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পাবনার আতাইকুলা গ্রামে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে চিন্তাভাবনা করে তিনি 'ফার্মেসি'কেই ব্যবসায় হিসেবে বেছে নিলেন; গ্রামের বাজারে দিলেন ছোট একটি দোকান। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে যুক্তফ্রন্ট সরকার তখন ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে পেয়ে যান ওষুধ কারখানা স্থাপনের একটা লাইসেন্স। তিনিসহ আরো তিন বন্ধুর সঙ্গে মিলে প্রত্যেকে ২০ হাজার টাকা করে মোট ৮০ হাজার টাকায় পাবনায় কারখানা স্থাপন করলেন স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস। স্কয়ারের নামকরণও করা হয়েছিল চার বন্ধুর প্রতিষ্ঠান হিসেবে। তাই এর লোগোও তাই বর্গাকৃতির। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের স্থাপিত প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে ৩০ হাজার শ্রমিক কর্মরত। শুধু ঔষুধেই নয়, এই শিল্প গ্রুপের ব্যবসায় সম্প্রসারিত হয়েছে প্রসাধনসামগ্রী, টেক্সটাইল, পোশাক তৈরী, কৃষিপণ্য, তথ্যপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা এমনকি মিডিয়াতেও। দেশের অন্যতম বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল মাছরাঙার তিনি ছিলেন চেয়ারম্যান। স্কয়ার গ্রুপ ২০০৯-১০ অর্থবৎসরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক *সেরা করদাতা* নির্বাচিত হয়েছিলো।

সম্পৃক্ততা

চেয়ারম্যান, স্কয়ার গ্রুপ
চেয়ারম্যান, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ
চেয়ারম্যান, এস্ট্রাস লিমিটেড
সম্মানিত সদস্য, কুর্মিটোলা গল্‌ফ ক্লাব
সাবেক চেয়ারম্যান, মাইক্রো ইন্ড্রাস্ট্রিজ ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস (মাইডাস)
চেয়ারম্যান, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ চ্যাপ্টার, ২০০৪-২০০৭
সভাপতি, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ড্রাস্ট্রি, ঢাকা (১৯৯৬-১৯৯৭)
সহ-সভাপতি, ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, বাংলাদেশ
সাবেক পরিচালক, দ্য ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ড্রাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)
সদস্য, নির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ ফ্রান্স চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ড্রাস্ট্রি
পরিচালক, ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি অব বাংলাদেশ
চেয়ারম্যান, সেন্ট্রাল ডিপোজিটোরি এজেন্সি অব বাংলাদেশ
সদস্য, উপদেষ্টা, কমিটি অব দ্য বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ড্রাস্ট্রিস
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানিজ

পুরস্কার ও স্বীকৃতি

দেশের বেসরকারি খাতে শিল্প স্থাপন, পণ্য উৎপাদন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জাতির আয় বৃদ্ধিসহ সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার কারণে ২০১০ খ্রিস্টাব্দে সরকার ৪২ জন ব্যক্তিকে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সিআইপি (শিল্প) নির্বাচন করে। তন্মধ্যে বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর ১৮ জনের মধ্যে একজন ছিলেন স্যামসন এইচ চৌধুরী।

দ্য ডেইলি স্টার এবং ডিএইচএল প্রদত্ত বিজনেসম্যান অব দ্য ইয়ার (২০০০)
আমেরিকান চেম্বার অব কমার্সের (অ্যামচেম) বিজনেস এক্সিকিউটিভ অব দ্য ইয়ার (১৯৯৮)

প্রমথ চৌধুরী

(আগস্ট ৭, ১৮৬৮ যশোর - সেপ্টেম্বর ২, ১৯৪৬ কলকাতা)। তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল বাংলাদেশের পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামে। তাঁর শিক্ষাজীবন ছিল অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ। তিনি ১৮৯০সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে এমএ ডিগ্রী লাভ করেন এবং পরে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলাত যান। বিলাত থেকে ফিরে এসে ব্যারিস্টারি পেশায় যোগদান না করে তিনি কিছুকাল ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনা করেন এবং পরে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম ছিল বীরবল। তাঁর সম্পাদিত সবুজপত্র বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষারীতি প্রবর্তনে আগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তাঁর প্রবর্তিত গদ্যরীতিতে "সবুজপত্র" নামে বিখ্যাত সাহিত্যপত্র ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁরই নেতৃত্বে বাংলা সাহিত্যে নতুন গদ্যধারা সূচিত হয়।

<u>রচনাসমগ্র</u>

তেল নুন লাকড়ী (১৯০৬)
বীরবলের হালখাতা (১৯১৭)
রায়তের কথা (১৯১৯)
চার-ইয়ারী কথা
আহুতি
প্রবন্ধ সংগ্রহ
নীললোহিত
পদচারণ
নানাচর্চা (১৯২৩)
প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমান (১৯৫৩)